НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

এই মেডেলটির গল্প আখ্যানের শেষ অনুচ্ছেদে

একজন স্তালিন দেশের মানুষকে নির্বিচারে গুলাগে পাঠান, অদৃশ্য সুতোয় নিয়ন্ত্রণ করেন দেশের তাবৎ শিল্পী সাহিত্যিকদের, যৌথ খামারিকরণের নামে কৃষকদের শুকিয়ে মারেন আর বিচারের চিত্রনাট্য সাজিয়ে তাঁর সমালোচকদের গণহারে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর লোহার নিগড়ের নিচে সোভিয়েত দেশের মানুষেরা ভয়ে ভয়ে বাঁচে, এই বুঝি এনকেভিডি তুলে নিয়ে যায়! আরেকজন স্তালিন শত্রুর আক্রমণের মুখে মস্কো ছেড়ে সপরিবারে কুইবিশেভের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশকে গভীর দূরদৃষ্টি নিয়ে প্রায়-ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তোলেন আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিয়ে পৌঁছন এক বিস্ময়কর উচ্চতায়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমান গুরুত্ব আরোপ করেন ভাষা, সাহিত্য, শিশু-কিশোর প্রকাশনা, ব্যালে কিংবা ফিল্ম ইন্সটিটিউটে, আপাদমস্তক অকমিউনিস্ট নাট্যনির্মাতার জন্য পরম মমতায় লালন করেন দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনয়কেন্দ্রটি। তাঁর ছেলে ফ্রন্টে যান যুদ্ধবন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করতে, স্ত্রী কারখানায় শ্রমিকের ডিউটিতে যান পাবলিক বাসে চেপে, আর মৃত্যুর পর সেই 'একনায়কের' সঞ্চয়ে যতটুকু রুবল পাওয়া যায় তাতে একজন সরকারি কর্মকর্তার এক সপ্তাহের প্রাতরাশটুকুরই খরচ ওঠে।

কোন স্তালিন যে সত্যিকারের স্তালিন, তা নিয়ে জিজ্ঞাসু মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা থাকাটাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হল, সেই অনুসন্ধিৎসার বশে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে চার চারবার স্তালিনের দেশে ভ্রমণ। লেখক বইপত্র আর আন্তর্জালে আটকে না থেকে সরেজমিন উত্তরের খোঁজ করাটাকে দরকারি মনে করেছেন, বারবার ফিরে গেছেন ভেঙে যাওয়া একদা-সোভিয়েত দেশের কাছে। ইতিহাস ও বর্তমানের রক্তক্ষরণকে বুঝতে সময় কাটিয়েছেন, কথা বলেছেন, মিছিলে হেঁটেছেন সেখানকার মানুষজনের সাথে। নিরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন স্তালিনযুগের কোন কোন অবশেষ মানুষ চেতনায় ধরে রেখেছেন বা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশভাক্ আজকের প্রবীণদের সাথে তাঁর কথোপকথন, এবং অসামান্য আলোকচিত্রগুলিও, এই বইয়ের অতীব দামি সম্পদ।

স্তালিনের প্রতি লেখকের পক্ষপাত রয়েছে, তাকে তিনি লুকোতে চাননি। বরং একটা সৎ আবেগ থেকেই স্তালিনকে দু'ছত্র গালি দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের সহজ রাস্তা তিনি পরিহার করেছেন। তাঁর মতামতের সঙ্গে পাঠক একমত নাই হতে

পারেন। আমরাও যে সবক্ষেত্রে হয়েছি, তা কিন্তু নয়। যেমন ধরা যাক, ব্যক্তি-পুঁজিবাদের প্রতিনিধি ক্রুশ্চভকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসা ব্রেজনেভের মডেল ছিল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের; যে কারণেই ব্রেজনেভ ও তাঁর পর আন্দ্রপভ, চেরনেনকোদের 'স্তালিনবাদী' বলে ধরে নেওয়ার একটা প্রবণতা চালু রয়েছে। এই প্রবণতার প্রভাবেই হয়তো লেখক স্তালিনবিরোধী ধারার মুখ হিসাবে ক্রুশ্চেভ, গরবাচেভ আর ইয়েলতসিনকেই চিহ্নিত করে গেছেন, ব্রেজনেভ থেকে চেরনেঙ্কো পর্যায় নিয়ে নীরব থেকেছেন। বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের সেই কুখ্যাত গোপন রিপোর্ট পেশ হওয়ার পরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরের প্রতিক্রিয়া জানাটাও জরুরি ছিল। আর স্তালিনের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নে মাও ৎসে-তুঙের বহুবিতর্কিত সেই '৭০/৩০ শতাংশ' বিশ্লেষণের প্রসঙ্গটিও আসতে পারত, মাও প্রসঙ্গ যখন এনেছেনই লেখক। অবশ্য বইটি রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিক গবেষণার দলিল নয়, লেখকও কোনো রাজনৈতিক ভাষ্যকার নন। এটি একটি খোঁজ। অতিকথনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সময়, বাস্তবতা আর সীমাবদ্ধতাকে ঘেঁটে একটা গোটা স্তালিনকে খুঁজতে চাওয়া। এটা থেকে আজকের রাশিয়া বা জর্জিয়ার পলিটিক্সের কিছু সুলুকসন্ধান পাওয়া গেলেও পলেমিক্সের খোঁজ আমরা করতে যাব না। এ বই থেকে যেটুকু পাওয়া যাবে, তাও নেহাত কম কিছু নয়।

ইন্টারনেটে 'ডিক্টেটর' শব্দটি লিখলেই যখন হিটলারের সঙ্গে অবধারিতভাবে ভেসে ওঠে স্তালিনের নাম, তখন বইয়ের নাম নিয়ে লেখকের ক্ষীণ সংশয় ছিল — পাঠক আবার ধরে বসবেন না তো যে আমরা সেই একমুখী প্রচারকেই মান্যতা দিচ্ছি! আমরা পাঠকদের উপর আস্থা রেখেছি। 'ডিক্টেটর' শব্দটি স্তালিনকে নয়, তাঁদেরই বিদ্ধ করবে যাঁরা ওই একদেশদর্শী প্রচারের প্রবক্তা। এতটা বলার পরেও লেখক তখনো খুঁতখুঁত করছেন দেখে আমরা বললাম "মার্কসবাদের নিরিখেও যদি ধরেন, তাহলে জোসেফ স্তালিন তো ডিক্টেটর বটেই, ডিক্টেটরশিপ অফ প্রলেতারিয়েতের অবিসংবাদী মুখচ্ছবি যে তিনি, তাতে সন্দেহ কী?" অবশেষে লেখকের হাসিমুখ আমাদের আশ্বস্ত করল।

শুদ্ধব্রত দেব,
নির্বাহী সম্পাদক

শুরুর আগের শুরু

ছোটবেলায় জানতাম সোভিয়েত দেশ একটা পত্রিকার নাম। প্রতি মাসে বুকপোস্টে বাড়িতে আসে। তার পাতায় পাতায় ঝকঝকে ছাপা, রঙচঙে ছবি আর মন ভালো করে দেওয়া একটা গন্ধ। একটু বড় হয়ে সে ধারণা গেল পাল্টে। তখন মনে হলো সোভিয়েত দেশ আসলে একটা রূপকথা। এক জীবন্ত রবিন হুড-এর গল্প। বড়দের মুখে শুনতাম, সে এক এমন এক দেশ যেখানে বড়লোক, গরীবলোক নেই। সেখানে মজুরের ছেলে কলঘরে জল তোলে না – স্কুলে যায়। সেখানে সকাল আসে কারখানার সাইরেনের শব্দে। সাইবেরিয়া থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ায় বন বন করে ঘুরতে থাকে হাওয়া মোরগ। ইভানের মা আরও অনেকের সাথে ফিটফাট হয়ে চকোলেট ফ্যাক্টরিতে কাজে যায়। ইভানের বাবুশকা নুনে জারিয়ে রাখা শশার বয়ম রোদে দেয়। বেলা বাড়ে, পারদ কমে, তারপর শুরু হয় বরফ পড়া। প্রথমে গাছেদের হাত পা, জানলার কার্নিশ, তারপর পথ ঘাট, প্রান্তর ঢেকে যায় সাদা বরফের চাদরে। দিনান্তে সকলে নিজের নিজের ঘরে ফেরে। সে ঘরে প্রাচুর্য নেই, আন্তরিকতা আছে। আড়ম্বর নেই, উষ্ণতা আছে। শান্তি আছে, ন্যূনতম সুখটুকু আছে।

আরও একটু বড় হয়ে জানলাম সাইবেরিয়ার বরফক্ষেত্রের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা এক যুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে আড়াআড়ি আলাদা করে দিয়েছে। দুই শিবিরের মধ্যে মুখ দেখাদেখি আর নেই। এক দিকের ক্যাপ্টেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমরা, মানে ভারত, আপাতনিরপেক্ষতা দেখালেও অবধারিতভাবে সোভিয়েত পক্ষপাতদুষ্ট। তাই তখন য়ুরি গাগারিন মহাকাশ ঘুরে পাক খেতে খেতে রোজ নামেন আমাদের বাড়ির ছাদে। আমাদের পাড়ার গোলপোস্ট রাত

মস্কোয়, প্রথমবার

২০১৭-র এপ্রিল এর শেষে আমার মস্কোগামী এরোফ্লোতের বিমান সেরেমেতিয়েভো বিমানবন্দরের টারম্যাক ছুঁল স্থানীয় সময় ভোর সারে পাঁচটায়। বাইরে তাপমাত্রা তখন পাঁচ ডিগ্রি হলে কী হবে, প্লেনের ভিতরে বসে আমি উত্তেজনায় ঘেমে নেয়ে অস্থির। ভ্লাদিমির লেনিন, জোসেফ স্তালিন, মাক্সিম গোর্কি, আইজেনস্তাইন, য়ুরি গাগারিনের দেশ। সেই মাটি স্পর্শ করছি আমি! কোনও রকমে ইমিগ্রেশন-কাস্টমসের যাবতীয় ফর্মালিটি মিটিয়ে বাইরে এসেই মস্কোর খোলা আকাশের নিচে প্রথম শ্বাস নিলাম। এবার গন্তব্য কলকাতা থেকে অনলাইনে বুক করে রাখা মস্কোয় আগামী তিন রাতের ঠিকানা — ৪০/১/২ খরোশেভ্স্কয়ে শোসে।

ট্যাক্সির জানালার কাচে নাক চেপে ধরে যা দেখছি তাই আশ্চর্য ঠেকছে, অবিকল পশ্চিম ইউরোপের আর পাঁচটা দেশের রাজধানীর মতোই যে! ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি-র মতো গ্লোবাল ব্র্যান্ডের নেভা নিওনে সাজানো রাস্তার দু'ধার। পথঘাট, বাড়ি ঘরদোর, সাজপোশাক দেখে দিব্যি বোঝা যাচ্ছে, এ দেশ আর আমার 'সোভিয়েত দেশ'-এর পাতায় দেখা দেশটি নেই। একদিন যে শহর ছিল মেহনতি মানুষের মক্কা, আজ তা মস্ত মস্ত ধনকুবেরদের মদিনা। মাঝে মধ্যে শুধু সাবেকিয়ানায় স্বতন্ত্র সোভিয়েত আমলের হাতে গোনা ক'টি বাড়ি আমার কৈশোরের সোভিয়েত দেশের চেনা ছবির ঝলক হয়ে পিছনপানে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখে পড়ল বিশালাকায় একটা ভবন। তার স্থাপত্য একেবারে আলাদা, মাথা তার আকাশ ছুঁয়েছে যেন! আর তার চূড়ায় ঝকঝক করছে সেই তারা। যে পাঁচকোণা তারা বহুদিন ধরে পৃথিবীর সমাজতন্ত্র নির্মাণের নাবিকদের পথ দেখিয়েছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটি স্তালিনপর্বে নির্মিত সেভেন সিস্টার্সের

লেনিনের অফিসবাড়িতে রাত্রিযাপন

লেনিনগ্রাদস্কি স্টেশন থেকে বুলেট ট্রেন ছাড়ল। গ্রেগরি আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে বিদায় জানাল। এই তীব্রগতির ট্রেন বিমানপথকে মাত্র চারঘন্টায় অতিক্রম করে নিয়ে গিয়ে ফেলবে রুশ বিপ্লবের আঁতুড়ঘর বাল্টিক সাগরঘেঁষা লেনিনগ্রাদে (এখন যা সেন্ট পিটার্সবার্গ)। বর্তমান রাশিয়ার এ শহর এখন প্রমোদনগরী। ভ্লাদিমির লেনিনের স্মৃতি জড়ানো শহরটা এখন পাল্টে গেছে। এক মস্ত ক্যানাল শহরটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে, যার ওপরে আছে তিনশো বিয়াল্লিশটা ব্রিজ। নৌকায় চেপে সেই ক্যানাল ধরে ঘুরে নেওয়া যায় গোটা শহরটা। আর আছে নেভা নদী। লেক লাগোদা থেকে যে নদীর জন্ম। শহরের প্রাণকেন্দ্র নভস্কি প্রসপেক্ট বিনোদনের কেন্দ্রস্থল। সেখানে সারাদিন খানা, পিনা, নাচা, গানা অবিরাম — তার ধার ঘেঁষে নদীর পাড়েই আমার অ্যাপার্টমেন্ট।

এ শহরে পা রাখতেই মন মাথা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এই সেই শহর যা ১৯৪১-এর ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ পর্যন্ত দু'বছর চারমাস উনিশদিন টানা অবরুদ্ধ থেকে লড়াই করেছে। চারদিক থেকে ঘিরে, সমস্ত যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করে হিটলারবাহিনী বিশ্বের মানচিত্রে মুছে দিতে চেয়েছিল লেনিনগ্রাদের চিহ্নটুকু। পারেনি। স্তালিনের নাম মুখে আর হৃদয়ে রেখে লড়ে গেছেন এ শহরের বীর নাগরিকরা। প্রবল ঠান্ডা, খাদ্যের তীব্র অভাব, অসহনীয় কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করে গেছেন তাঁদের স্বদেশকে রক্ষা করার তাগিদে। হিটলার চেয়েছিলেন লেনিনের নামের এ শহরকে অনায়াসে দখল করে তার নাম রাখবেন নিজের নামে। এ শহরের অনমনীয় তেজ তাঁকে রুখে দিয়েছিল। শেষে তিনি চেয়েছেন এ শহরকে ধ্বংস করতে। পারেননি। দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু

১০০ বছর পরে, রাশিয়ায় ফিরে

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। দেশপ্রিয় পার্কে আমার পাড়ায় শীত আসার খবরটুকু শুধু। আর এখানে, মস্কো শহরে সকালবেলায় তাপমাত্রার পারদ নেমেছে এক ডিগ্রিতে। কনকনে হাওয়া আর মেঘলা আকাশ। কিন্তু সে হাওয়াতে, এই আকাশে উষ্ণতা মোটেও কিছু কম নেই। যেমন বুঝেছিলাম দ্যানিয়েলাকে সিগারেটের আগুন দিতে গিয়ে। পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী দ্যানিয়েলা। ওই আগুন চাইতে এসেই পরিচয়। প্রথম আলাপেই শোনাল, "জানো, আমাদের কবি ফার্নান্দো পেসোয়া কী বলতেন? পর্তুগিজ ভাষা আমার স্বদেশ। আমার মাতৃভূমিই আমার ভাষা। তাই বিশ্বের যে প্রান্তেই আমি যাই, আমার স্বদেশকে সঙ্গে নিয়েই যাই।" ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে আলাপ জমতে সময় নেয় না। "পর্তুগিজ কিন্তু পর্তুগালের রাষ্ট্রীয় ভাষা নয়, তা হলো স্প্যানিশ। পর্তুগিজ ভাষা সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয় একমাত্র আমাদের দেশে, ব্রাজিলে", বলল বেরার্ত আন্দ্রে, ব্রাজিলে কমিউনিস্ট পার্টি করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমি মোটেই একা নই। অচেনা, কিন্তু কাছের অনেকগুলি মানুষ ঘিরে রেখেছেন আমাকে। শীত শীত ভাবটাও যেন কম লাগছে একটু।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে কমিউনিস্ট ইন্টারব্রিগেড তিনদিনব্যাপী উদ্‌যাপন কর্মসূচী নিয়েছে মস্কোয়। ৫, ৬ আর ৭ নভেম্বর জুড়ে চলবে সে সমারোহ। মাত্র ক'সপ্তাহ আগে সেই সমারোহের আমন্ত্রণ চিঠি আমার কম্পিউটারের ডাকবাক্সে আবিষ্কার করে চমকে গিয়েছিলাম। একদম দেরি করিনি সিদ্ধান্ত নিতে। তাই মাত্র পাঁচমাসের তফাতে ২০১৯-এর ৫ নভেম্বর ফের আমি মস্কো শহরে। এখন এ আমার চেনা শহর। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছে লোটাকম্বলটুকু গস্ত করতে